The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp.127 - 148)
Published in October, 2023

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন: বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ

শাসনানন্দ বড়ুয়া রুপন*

প্রতিপাদ্যসার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা ভাবনা গৌতম বুদ্ধের এক শ্রেষ্ঠ উপহার। সৎ, আলোকিত ও আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলনের দ্বারা পরিপূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটে। বিশ্বশান্তি, বিশ্বমানবতা ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্বমৈত্রী তথা বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শনের দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণ সহজ হতে পারে। গৌতম বুদ্ধ জগতকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন। তিনি একটি নৈতিক ও জীবনভিত্তিক ধর্ম দর্শনের প্রবর্তন করেছিলেন। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার সাধনার মাধ্যমে মানুষের মানবিকতা বিকশিত হতে পারে। মানবিকতা বিকশিত না হলে চিত্তের পাশবিক দিকটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে হিংসা, বিদ্বেষ, বৈরীতা, ঘৃণা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা বেড়ে যায়। ফলে সমাজে অশান্তি, অসহিষ্ণুতা, অমানবিকতা, অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধ সর্ব প্রকার বিরাজমান অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার লক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণের অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা অপ্রমেয় ভাবনা (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা) অনুশীলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মানুষকে। তাছাড়া সৎ জীবন-যাপন, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি, সদ্‌গতির প্রয়াসে এ ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং বলা যায় যে, এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা দ্বারা মানুষ ইহলোকে শান্তিময় জীবন-যাপনান্তে মৃত্যুর পরে সুগতি বা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হতে সক্ষম হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের অনুশীলন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিকতা বিকাশে যে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখা সম্ভব তা আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকাঃ

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা) দর্শন বা অপ্রমেয় ভাবনার উপকারিতা অপরিসীম। অন্তর থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, বৈরিতা পরিহার করে দয়া, সমতা, ন্যায় পরায়ণতা, ত্যাগ, বিশ্বশান্তি, মানবিকতা, মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যে ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। বুদ্ধ হিংসামুক্ত, বৈরীতামুক্ত, ভেদাভেদমুক্ত, মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সর্বস্তরের মানুষের জন্য ব্রহ্মবিহার দর্শনের উপদেশ প্রদান করেন। ইচ্ছে করলে যেকোনো ব্যক্তি এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা করতে পারে। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং মানুষের চিত্ত অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে। এতে করে সহিষ্ণু, পরোপকার, কল্যাণভিত্তিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এ দর্শনের দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উপর্যুক্ত কারণে এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের অনুশীলন ব্যক্তি জীবনকে মহিমান্বিত করে এবং বিশ্বশান্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। মানুষে মানুষে সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, একতা, সম্প্রীতির বন্ধন, পারস্পরিক সহ অবস্থান, প্রীতির আদর্শ, সাম্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ, সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, অহিংসা, সাম্যনীতিকে ধারণ, মনন, লালন, চর্চার ক্ষেত্রকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে এ ভাবনার অনুশীলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র মানবজাতি তথা সর্ব সত্ত্বকে আপন করে নেয়ার মূলমন্ত্র হলো এ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি গুণী, সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি সর্বস্তরের মানুষের নিকট প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে নন্দিত ও সমাদৃত হন। একজন ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি কখনও মানুষের বা প্রাণীজগতের অশান্তি সৃষ্টি বা অনিষ্ট করেন না। আবার ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তির কোনো ব্যক্তি ক্ষতি করতে পারে না। ব্যক্তি স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তির লোভ, হিংসা, ক্রোধ, মোহ, স্বার্থান্ধতা থাকে না। ফলে তিনি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি লোভ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা মানব সমাজে কোনো প্রকার অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনার অর্থ

'ব্রহ্মবিহার' বলতে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, আদর্শ, মানবিক জীবন-যাপনকে বোঝায়। স্বীয় অন্তরে ও কর্মে অহিংসাবোধ বা মৈত্রী, দয়া, সাম্যভাব পোষণ, মনন ও লালন করাই হলো "ব্রহ্মবিহার" ভাবনা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনাকে একত্রে ব্রহ্মবিহার দর্শন বা বিশুদ্ধির পথ হিসেবে অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত করা হয়। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার' অর্থ শ্রেষ্ঠ বা সাত্ত্বিকরূপে বসবাস করাকে বোঝায় (বুদ্ধঘোষ ভিক্ষু ২০১৭, ৩৮১)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ব্রহ্মার-আচার-আচরণরূপে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বসবাস করাই হলো ব্রহ্মবিহার দর্শন। এ দর্শন দ্বারা সর্ব জীবের প্রতি অপ্রমেয় আন্তরিক অনুভূতি জাগ্রত করা যায়। এ অনুভূতি প্রতিফলিত হবে আচরণীয় উপরোল্লেখিত চারটি ধারায়। এরূপে যাপিত জীবনই হলো হলো শ্রেষ্ঠ।

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন : বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ

বৌদ্ধধর্ম, ধর্ম হলেও এটি একটি দর্শন। এ দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা ভাবনার গুণ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনা বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন চর্চা মানুষকে আলোকিত জীবন গঠন ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার অনুশীলনের দ্বারা মানবতা, মানবিক বিশ্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য।

ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন মানুষকে মানবিকতা অর্জন করতে সাহায্য করে। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের বস্তুকেন্দ্রিক উৎকর্ষ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিলাসিতা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। দেশ থেকে দেশান্তরের সীমা পেরিয়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে ভ্রমণও মানুষ আয়ত্ত করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাহীন উন্মেষ সাধনের মাঝেও মানুষের মনের ভারসাম্য ও মানসিক শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য, অশান্ত বিশ্বে শান্তি, মানব জীবনে অনাবিল সুখ প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। মানব সমাজে বিরাজমান উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, যুদ্ধ, হানাহানি, শত্রুতা, অনৈক্য, অশান্তি দূর করতে হলে এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্ব নানা সমস্যায় নিমজ্জিত। তার মাঝে চরম আকার ধারণ করেছে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, যুদ্ধ, হানাহানি, বৈষম্য, অবিশ্বাস। পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ, বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে হিংসা-বিদ্বেষ, অশান্তি। আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, স্বার্থান্ধতার কারণে মানব জীবনে অশান্তি বিরাজমান। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, হানাহানি লেগেই আছে। আধুনিক বিশ্বে বিরাজমান অন্যায়, অমানবিকতা, অশান্তি, ভেদাভেদ, সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুর প্রতিও মৈত্রীভাব পোষণ করতে হবে। অহিংসা, সাম্যভাব, দয়া, ত্যাগ, সাধনা অনুশীলন দ্বারাই প্রকৃত মানবতার উদ্ভব এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। বুদ্ধের জীবনেও আমরা দয়া, মৈত্রী, ক্ষমার পরিচয় পেয়ে থাকি। বুদ্ধের মৈত্রী গুণ ছিলো অপরিসীম। ত্রিপিটক সাহিত্যে এর সপক্ষে বহু উদাহরণ ও কাহিনী দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দেবদত্তের প্ররোচণায় রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। গুপ্ত ঘাতক জেনেও বুদ্ধ অজাতশত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। মৈত্রী বাণী দেশনা করে তাকে সদ্ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ মৈত্রী শক্তির বলেই বুদ্ধ অকল্যাণকারী, দুষ্ট, শক্তিশালী মার দেবরাজ, খুবই হিংস্র ও শক্তিধর আলবক যক্ষ, হিংস্র অবুঝ প্রাণী মাতাল নালাগিরি হস্তী, নরহত্যাকারী ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন অঙ্গুলিমাল, অসৎ ও মায়াবী সুন্দরী চিঞ্চা মানবিকা, অহংকারী দাম্ভিক দার্শনিক সচ্চক পরিব্রাজক, ভয়ংকর নন্দোপনন্দ নাগরাজ এবং নিজেকে ঈশ্বর মনে করা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন বক ব্রহ্মাকে বুদ্ধ বিনা অস্ত্রে, বিনা রক্তপাতে এমনকি বিনা বাকবিতণ্ডায় জয় করেছিলেন। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের ধর্মপদ গ্রন্থে রয়েছে :

নহি বেরেন বেরানি সম্মান্তিধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো (মহাস্থবির ১৯৫৪, শ্লোক নং-৫, ২)।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না। মিত্রতা বা বন্ধুত্বের দ্বারা শত্রুতার উপশম হয়। এটাই সনাতন ধর্ম। গুণী, সহিষ্ণু, শান্তিপূর্ণ, সুখময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার ভাবনা অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৌদ্ধধর্ম দর্শন মানুষের মঙ্গল ও মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচারিত হয়েছিলো। বিশ্ব সভ্যতায় মানবতার প্রবক্তা বুদ্ধ এবং মানবতা সতত প্রকাশমান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে। বৌদ্ধ দর্শন যে সম্পূর্ণরূপে মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা চিরন্তন ও শাশ্বত (বড়ুয়া, ২০০০, ৯৭-১০০)। মানুষের অন্তর সত্তা বিকশিত হলেই মনুষ্যত্ব, মানবিকতাবোধ জাগ্রত হয়। মানবিকতা বিকাশে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের অনুপম প্রকাশ ব্রহ্মবিহার ভাবনার আবেদন অনবদ্য। আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি সর্বত্র নন্দিত ও সমাদৃত হন। তাঁকে সবাই সম্মান, শ্রদ্ধা করে। কারণ, তাঁর দ্বারা বিশ্বজগতে, বিশ্বমানবতার কোনো প্রকার অকল্যাণ, অমানবিক কার্য সম্পাদনের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে বিশ্বশান্তি সমুন্নত থাকে। মনে যখন মৈত্রী চেতনার সঞ্চার

হয়, মন তখন মানবিকতা, দয়া, করুণা, প্রেম ইত্যাদিতে শুভ্রভাবে সিক্ত ও পূর্ণ হয়। এরূপ চেতনায় কর্ম অনাবিলতার কারণে সুন্দর, সুশোভন ও কল্যাণমূলক হয়। এ জন্য একে কল্যাণ বা কুশলকর্ম নামে অভিহিত করা হয়। তন্মধ্যে ব্রহ্মবিহার ভাবনা হলো অন্যতম কুশল কর্ম। ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলনে চিত্ত যখন শান্ত, সরল, বিশুদ্ধ, নির্মল হয় তখন মনে আনন্দের ফল্গুধারা, শান্তিধারা বইতে থাকে। শান্ত চিত্তের অধিকারী ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি মানবিকতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সক্ষম হন। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ ঘটে। বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার বিকাশে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। সহিষ্ণুতা, সমতা, বন্ধুত্বভাব, মানবিকতা ও বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম বলে প্রতীয়মান হয়। অহিংসা বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের শ্রেষ্ঠ নীতি, অক্রোধ এ ধর্ম দর্শনের উচ্চ আদর্শ এবং শান্তি পরম লক্ষ্য (দাশ গুপ্ত ১৯৯৮, ১০৪)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলনের দ্বারা মানবিকতার বিকাশ সাধিত হয়। ফলে মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হয়। সত্যিকার অর্থে ঘৃণার পরিবর্তে মৈত্রীর দ্বারা শত্রুরও হৃদয় জয় করা যায়। হিংসাকে অহিংসা দ্বারা জয় করতে হবে। ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করা সম্ভব হয়। এ মৈত্রী শক্তি দ্বারাই বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলে ক্ষত-বিক্ষত, হিংসা-বিদ্বেষ জর্জরিত এ মানবকূলে ও প্রাণীকুলে শান্তি বিরাজ করবে। সত্যিকার অর্থে আধুনিক মানব সমাজে বিশ্বশান্তি, মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণে ব্রহ্মবিহার ভাবনা গুরুত্ব অপরিসীম। তার (ব্রহ্মবিহার দর্শনের) আলোকে চিত্ত শুদ্ধিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানব চিত্তের পরিশুদ্ধিতা ছাড়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এ চিত্ত শুদ্ধিতার জন্যে ব্রহ্মবিহার অনুশীলন অত্যাবশ্যক। মৈত্রীর গুণ ও শক্তি অতুলনীয় ও অচিন্তনীয়। এ মৈত্রী ভাবনা দ্বারা মানুষের অন্তর কলুষমুক্ত হয়, পাপমুক্ত হয়, হিংসামুক্ত হয়, দ্বেষচিত্ত মুক্ত হয়, তাঁদের চিত্ত স্বর্গীয় সুষমায় সুষমামণ্ডিত হয়। এ ভাবনা মানুষকে ক্ষমা ও প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে সরাসরি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হতে সক্ষম হয়। তাঁর অন্যতম উপদেশ হলো সর্বজীবে দয়া। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে :'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।' অর্থাৎ, বিশ্বের সর্ব প্রাণী সুখী হোক। বুদ্ধ সর্ব প্রাণীর প্রতি অপার মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করেন। মৈত্রীচিত্ত ধারণ পূর্বক অবস্থান করা মানুষের জন্য উপকারী। এরূপে বসবাস করলে মানুষের চিন্তায় কোনোভাবেই উত্তেজনা ও হিংসা ভাবের উদ্রেক হয় না। এর ফলে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এ শান্ত চিত্তেই আধ্যাত্মিক সাধনায় সাধককে উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বুদ্ধ অপ্রমেয় মৈত্রীভাবকে সর্বদিকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শন মানুষকে সকল প্রকার অকুশল, অশুভ, অকল্যাণ, অশান্তি, অমানবিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করতে সাহায্য করে। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, বিশ্ব জগতের শান্তি বিনষ্ট হয় এমন কর্মকাণ্ড পরিহার করে চলেন। এরূপ ব্যক্তি সবাইকে তা মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আলোকিত জীবন গঠন, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় শান্তি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা করা খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা হলো মানুষের মানবীয় উচ্চতর সদ্‌গুণ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিকতা বিকাশে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের মূল উপাদান প্রসঙ্গ নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

মৈত্রী

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের প্রথম স্তর হলো মৈত্রী। এ মৈত্রী হলো মানুষের সকল গুণসম্ভারের উৎস। হিংসা, বিদ্বেষ পরিহারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পালিতে 'মেত্তা' শব্দের বাংলা অর্থ হলো 'মৈত্রী'। এটি মিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ। সংস্কৃত অনুসারে এর অর্থ হলো মিত্রতাভাব বা মৈত্রী; যা মনকে কোমল করে, অথবা মিত্রতা স্বভাব বা বন্ধুত্বই মৈত্রী নামে অভিহিত। এ 'মৈত্রী' শব্দটি মিত্রতা, বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা, পরোপকারিতা, শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য, সৌজন্য ইত্যাদি গুণধর্মের নামান্তর। এ মৈত্রী

নিষ্কাম প্রেম হিসেবে অভিহিত (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া ২০১০, ১৩১)। এ মৈত্রীর পরিভাষা হলো বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব। পরিশুদ্ধ জীবন-যাপন মৈত্রী ভাবনার অনুশীলন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিশ্বমৈত্রী ভাবনা সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার বিকাশে ব্রহ্মবিহার ভাবনা অমূল্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের ইতিবুত্তকে মৈত্রীকে অতি ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। স্নেহ বা প্রীতি, সৌহার্দ্যে অনুরাগই মৈত্রীর নামান্তর। এর অর্থ হলো সকল প্রাণীর প্রতি স্নেহ বা প্রীতিবহুল মৈত্রী ভাব পোষণ করা। মিত্র বা বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন কিংবা মিত্রত্বে সেরূপ প্রবর্তিত হওয়াকেই মৈত্রী নামে অভিহিত করা হয়। তথাপি বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যে আঘাত বা বিদ্বেষে নম্রতা বা বিনয়ীভাব এবং সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি বা সুখকর ভাবদর্শন ও প্রত্যক্ষকরণ। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, "আদর করা, স্নেহ করাই মৈত্রী অথবা মিত্রগণের মধ্যে বাস করাই হলো মৈত্রী *(ইতিবুত্তক, মূল পালি)*। মৈত্রী অর্থাৎ সৌহৃদ্যতা, মিত্রতা; সদ্ভাব সহযোগ অর্থে মৈত্রী। এ মৈত্রী বলতে নিজের মতো করে সর্বজীবকে দেখা। নিঃস্বার্থ মৈত্রীর সহিত করুণা, করুণার সহিত মুদিতা এবং মুদিতার সহিত উপেক্ষাভাব যথাক্রমে উৎপন্ন হয়ে মৈত্রী আচরণে ব্রহ্মবিহার ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কাজেই মৈত্রী ভাবনাকারী ব্যক্তিকে "মৈত্রীবিহারী বা ব্রহ্মবিহারী" নামে অভিহিত করা হয়। সর্বজীবের প্রতি নিঃস্বার্থপ্রিয়তা, আদর, স্নেহ ইত্যাদি প্রদর্শনই হলো মৈত্রীর নামান্তর। এর স্বরূপ কি ? জীব-জগতে প্রত্যেক জীবের নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর কিছুই নেই। সুতরাং নিজেকে, নিজের প্রাণকে প্রত্যেকে যেমন ভালোবাসে, আদর যত্ন করে, সর্বতোভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করে, জগতের জীবমাত্রেই তেমন নিজের প্রতি, নিজের প্রাণের প্রতি মমতা রাখে। এটা মনে করে সর্বজীবের প্রতি নিজ প্রাণের মমতা দিয়ে ভালোবাসার নাম পরম মৈত্রী। মৈত্রীতে লোভ থাকে না, হিংসা বা দ্বেষ থাকে না, মোহ থাকে না নিঃস্বার্থতার পরিপ্রেক্ষিতে; শুধু অনাবিল প্রশান্তভাব তখন চিত্তের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। এ মৈত্রীগুণে ক্রোধ পরিত্যক্ত হয়, ক্ষমাশীল হয় আর জীবের প্রাণে জাগিয়ে তোলে প্রশান্তির পবিত্র আনন্দ। অতএব মৈত্রীধর্ম শুধু মৌখিক বচনসার মাত্র নয়, নীতি আচরণে, অনুশীলনে, পালনে, রক্ষণে মৈত্রী সুপরিস্ফুট হয়ে থাকে। ক্রোধ ও মোহের মূল লোভ, লোভহীন হৃদয় দয়ার উৎস করুণার নির্ঝরিণী। এ দয়ায় জীব-জগতে আনীত হয় সাম্য-মৈত্রী। সাম্য-মৈত্রীই মুদিতার অর্থাৎ অপরের সুখে সুখী হওয়ার সুযোগ প্রদান করে থাকে (মহাস্থবির ৮০, ৮১)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সর্বপ্রাণীর প্রতি মমতাময় চিত্ত জাগ্রত রাখাই মৈত্রী। দয়া, পরোপকারীতা, সেবার সদিচ্ছা ইত্যাদি মৈত্রীর পর্যায়ভূক্ত। মৈত্রীর বিপরীতে রয়েছে দ্বেষ, ক্রোধ। এবং পরোক্ষ বিরুদ্ধচারী হলো–ব্যক্তিগত আসক্তি বা প্রেম বা অহংবোধ। সুতরাং মৈত্রীর অনুসারী হলে দ্বেষ, ক্রোধ ও অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। সকল প্রকার প্রাণীকে আপনবোধে অপ্রমেয় প্রেমে সিক্ত করতে হবে। দান, ধর্ম, সহযোগিতা ও পরোপকারীতা ইত্যাদিতে স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্যমী হতে হবে। তাহলেই মৈত্রীচর্চা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। (বড়ুয়া ও কান্তি বড়ুয়া, ২০০০ : পৃ. ৯৬) হিংসা, বিদ্বেষ হলো মৈত্রীর বিপরীত দিক। বিদ্বেষ পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মায়। ফলে হিংসার দাবানল জ্বলে ওঠে। এতে মানুষের মন হিংস্র পশুর চেয়েও খারাপ হয়। বিশ্বমৈত্রী ভাবনা হিংস্রতা ও গ্লানি থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করে। একে অপরের সম্পর্ককে মধুর করে এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। মন আকাশের মতো উদার, অসীম, শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়। মৈত্রী চিন্তা মানসিক ক্ষিপ্ততা, রুক্ষতা ও কঠোরতা বর্জন করার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। অহিতকর বিষয় অবলম্বনে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, মৈত্রী চিন্তা তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সৌম্যভাব ধারণ করে। এ চেতনা সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মনকে বিমুক্ত কওে (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ২০১০ খ্রি. প্রাগুক্ত, ১৩১, ১৩২)। জীবের হিত সুখ কামনা মৈত্রী। এর আলম্বন হলো প্রাণী (মুৎসুদ্দী ১৯৪০, ২৮৪)। সর্বসত্ত্বের সঙ্গে একাত্মবোধই হলো মৈত্রীর বিকাশ। সর্বজীবের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই মৈত্রী নামে অভিহিত। এটা দ্বেষ ধ্বংস করে। নিঃস্বার্থ পরোপকার এর স্বভাব (ভিক্ষু ২০১২, ৪৩)। মৈত্রী

আমাদের সহজাত সংস্কার। যদিও এর প্রকাশ সকল মানুষের মধ্যে সমান নয়। মৈত্রী মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে ঘনিষ্ট করে তোলে। এটি মানুষের বসবাসের পরিবেশকে পবিত্র করে তোলে। প্রেমের অনাবিল পরিবেশের মধ্যে শান্তির স্পর্শ হয় নিবিড়। কিন্তু হীন স্বার্থবুদ্ধি এ শুভ সংস্কারটিকে অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে দেয়। হিংসা বিদ্বেষের কুফল, ক্ষমাশীলতা প্রেমগুণ বিচার করাই সাধকের কর্তব্য। মৈত্রী ভাবনার মূল লক্ষ্য হলো ক্রোধ ও হিংসা পরিহার করা। এ মৈত্রী মানুষকে ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক প্রথম জীবনে নিষ্ঠুর প্রকৃতির, কঠোর স্বভাব সম্পন্ন লোক ছিলেন। নিগ্রোধ শ্রামণ সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। সেই শ্লোকটি হলো :

অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা (মহাস্থবির, ১৯৫৪ : শ্লোক নং -২১, প্রাগুক্ত, ৯)

অর্থাৎ, অপ্রমাদ অমৃত লাভের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অপ্রমাদ পরায়ণ ব্যক্তিরা অমর আর প্রমাদ পরায়ণ ব্যক্তিরা জীবিত থেকেও মৃত সদৃশ। এ শ্লোকটি শ্রবণ করে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোক তাঁর স্বভাবের জন্য চণ্ডাশোক নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মৈত্রীমূলক বৌদ্ধধর্ম-দর্শন গ্রহণ করে তিনি 'ধর্মাশোকে' পরিণত হয়েছিলেন। তিনি রাজ্য জয়, যুদ্ধ, নিপীড়ন, হিংসা নীতি পরিহার করেন। এর পরিবর্তে মৈত্রী, প্রেম, অহিংসা, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, মানবিকতা ও মানবতার আদর্শকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজ্য জয়ের পরিবর্তে ধর্ম বিজয়কে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। তাই তিনি মানবতা, মানবিকতার বৃত্তকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩২)। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ সর্ব জগতের সর্ব প্রাণীর প্রতি অপার মঙ্গল, মহামৈত্রী ও করুণার শিক্ষা প্রদান করেন। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের অন্যতম বেশিষ্ট্য হলো সর্বজীবে দয়া, বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা। যাঁরা মৈত্রীচিত্ত ধারণ পূর্বক অবস্থান করে তাঁদের চিন্তায় কোনোভাবেই উত্তেজনা ও হিংসা ভাবের উদ্রেক হয় না। সুতরাং তাঁরা সুখ-শান্তিতে বাস করতে সক্ষম হয়। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ শান্ত-অশান্ত চিত্তেই বিমুক্তের বীজ উপ্ত হয়ে সাধককে সাধনার উন্নততর স্তরে অগ্রসর করে। বুদ্ধ অপ্রমেয় মৈত্রীভাবকে সর্বদিকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে বিশ্বমৈত্রী বা করণীয় মৈত্রী সূত্রে রয়েছে : খালি চোখে দেখা যায় বা খালি চোখে দেখা যায় না, অর্থাৎ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, কাছে বা দূরে সকল প্রাণীকে ভালবাসার কথা বুদ্ধ শিক্ষা দেন। যেমন :

"দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা সবন্তু সুখিতত্তা (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)।

করণীয় মেত্ত সুত্তে বুদ্ধ মৈত্রী ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে বলেন :

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তা মনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)।

অর্থাৎ, মাতা যেমন একমাত্র সন্তানকে জীবন দিয়ে ভালোবাসেন, রক্ষা করেন অনুরূপভাবে তোমরাও সেভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। এ সম্পর্কে সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ গ্রন্থে রয়েছে :

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বে ভাযন্তি মচ্চুনো,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হাণেয্য ন ঘাতযে তি (মহাস্থবির ১৯৫৪ : শ্লোক নং-১২৯, ৪৮)।

অর্থাৎ, সকল প্রাণী দণ্ড, শাস্তি ও মৃত্যুকে ভয় পায়; তুমি যেভাবে এগুলোকে ভয় পাও, অনুরূপ নিজের সাথে উপমা বা তুলনা করে কারো দণ্ড, শাস্তি বা মৃত্যু বিধান করবে না। তাছাড়াও করণীয় মৈত্রী সূত্রের ৩ নং গাথায় বুদ্ধ আরো বলেন, যেসব সভয় বা নির্ভয়, দীর্ঘ, বড়, মধ্যম,হ্রস্ব, ক্ষুদ্র অথবা স্থূল প্রাণীসহ সকল প্রাণী সুখী হোক। একই সূত্রের ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, দাঁড়ান অবস্থায়, চলতে চলতে, বসে বসে, শুয়ে শুয়ে, যতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়বে না ততক্ষণ এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে অর্থাৎ মৈত্রীভাবনা করতে থাকবে। উপর্যুক্ত কারণে একেই ব্রহ্মাবিহার বলে। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বুদ্ধের উপরোক্ত উপদেশসমূহ কালজয়ী উপদেশ বলেই প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধ বলেন, সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত। অর্থাৎ, সকল প্রাণী সুখী হোক।
করণীয় মেত্ত সুত্তে রয়েছে :

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উধ্বং অধো চ তিরিযঞ্চ, অসম্বাধং অবেরমসপত্তং (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)

অর্থাৎ, প্রত্যেকে উপরদিকে, নিম্নদিকে, চতুর্দিকে সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয়, মৈত্রীপূর্ণ, বাধামুক্ত, হিংসামুক্ত, বিদ্বেষবর্জিত, শত্রুতাশূন্য মনোভাব পোষণ করা সমীচীন। ভদন্ত বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে মৈত্রী ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে মৈত্রী ভাবনার নিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে মৈত্রী ভাবনা করতে হয় প্রথমে নিজেকে নিয়ে। যেমন : আমি সুখী হই, আমি শত্রুহীন হই, দ্বেষহীন, রোগহীন হয়ে সুখে বাস করি। আমার মতো আমার আচার্য ও উপাধ্যায়গণ, মাতা-পিতা, উপকারী ব্যক্তি ও মধ্যম ব্যক্তি এবং শত্রু ব্যক্তিগণও শত্রুহীন, বিপদহীন, রোগহীন হয়ে সুখে বাস করুক, দুঃখ হতে মুক্ত হোক, সৎকার্য দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। এ জগতে সকলেই কর্মাধীন। (থেরো ও মুৎসুদ্দি, ১৯৩৬: পৃ. ২৭৩) দ্বেষ পরিত্যাগ করে ও ক্ষান্তিকে অবলম্বন করে, এ ভাবনায় অগ্রসর হতে হয়। যেমন, দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি প্রাণিবধ করে। এটা দ্বেষের স্বভাব। ক্ষান্তিই তপস্যার নামান্তর। এটা ক্ষান্তির স্বভাব। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, কি দেবতা, কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হোক, শত্রুর কল্যাণ হোক, সকলেই রোগ, শোক পাপ হতে মুক্ত হোক, এরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে (ঠাকুর ১৪০৫, ৯১, ২৪৯, ২৫০) এরূপে সকল দেশ, জনপদ, এমনকি স্বর্গ নরকে সকল প্রকারের প্রাণীগণ বিভিন্ন উপদ্রব ভয় হতে মুক্ত হয়ে সুখে জীবন-যাপন করুক বলে প্রার্থনা করতে হয়। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্ম কল্যাণ ও অন্যের কল্যাণ, বিশ্ব কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মানুষে মানুষে সকল প্রকার ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। এ মৈত্রী ভাবনা বিশ্ব মৈত্রীর এক অমর ও কালজয়ী বাণী হিসেবেই বিবেচিত। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, প্রথমে নিজের মঙ্গল চিন্তা করা হয়েছে। পরে মৈত্রী ভাবনা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। এটা ক্রমশ সকল পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রতি ব্যাপ্ত হয়েছে। এ ক্রমিক ধাপে মানুষের উদারতাভাব, চিত্তের প্রসারতার, বিকাশ ঘটে থাকে। নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জন্যও সমভাবে কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। নিজের কল্যাণ কামনার সাথে সাথে অন্যের কল্যাণ কামনা করা একান্ত প্রয়োজন। এটি করতে না পারলে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংবোধ, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, বৈরিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যার প্রভাবে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। মৈত্রী ভাবনা প্রসঙ্গে বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে রয়েছে : ভয় প্রাপ্ত প্রাণীরা ভয়হীন ও নিরাপদ হোক, শোকার্তগণ প্রীতি লাভ করুক, উদ্বিগ্ন যারা তারা নিরুদ্বেগ হোক (*বোধিচর্যাবতার)*।

রোগীরা আরোগ্য লাভ করুক, বন্দী প্রাণীগণ সকল বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করুক, দুর্বলেরা সবল হোক, সকলে পরস্পর স্নেহময় চিত্ত হয়ে বাস করুক *(বোধিচর্যাবতার)*।

যথা সুখী কৃতশ্চাত্বা মযাযং সর্ব দেনিং
ঘ্নন্তে নিন্দন্তু বা নিত্যমাকিরন্তু চ পাংসুভিঃ (স্থবির, ৬৬) ।।

অর্থাৎ, সর্ব প্রাণীর সুখ লাভ হোক। সকল প্রাণীর সুখ বিধানের নিমিত্তে আমি এ দেহ উৎসর্গ করলাম। তারা ইচ্ছে করলে এ দেহ হত্যা করতে, নিন্দা করতে কিংবা এতে ধুলা নিক্ষেপ করতে পারে।

মৈত্র্যাশয়শ্চ মতপূজ্যঃসত্ত্ব মাহাত্ম্যমেব তত্ ।
বুদ্ধ প্রাদাদ্যত্ পূণ্যং বুদ্ধ মাহাত্ম্যমেব তত (স্থবির, ১১৪)।

অর্থাৎ, জীবের প্রতি মৈত্রী সাধক শ্রদ্ধা লাভ করেন। তা জীবের মাহাত্ম্য বলা যায়। যেহেতু জীবকে ভিত্তি করেই মৈত্রী সাধনা আবর্তিত হয়। তা বুদ্ধেরই মাহাত্ম্য। ব্রহ্মবিহার সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক দেবব্রত সেন-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> *"ব্রহ্মবিহার ভাবনার মাধ্যমে আমিত্ব লোপ পায়, চিত্তের প্রসারতা বাড়ে। এটা সম্যক সমাধিরই মতো উপায়। এ পথে রাগ, দ্বেষ ও মোহরহিত হয়ে সাধক অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ কওে"*(সেন, ৮৯)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব মৈত্রী বুদ্ধের অমর সৃষ্টি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবিক ও আদর্শ জীবন-যাপন করার জন্য যাপিত জীবনে চার প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শন কেবলমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরঞ্চ বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেও এর অনুশীলন অপরিহার্য। কেননা, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হলো এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা। ব্যক্তিগত আক্রোশ, হিংসা, বিদ্বেষ এবং জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, যুদ্ধ, ধ্বংসের, অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা। এ ভাবনার আলম্বন অসংখ্য বা অপ্রমেয় সত্ত্ব, তাদের দুঃখ ও সম্পদ। এ কারণে এ ভাবনা অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত। এ চার প্রকার ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মবিহারী হওয়া সম্ভব হয় বলেই এটাকে ব্রহ্মবিহার নামে অভিহিত করা হয়। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা সুন্দর, মানবিক, উত্তম জীবন-যাপনের, বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি বা মূলমন্ত্র। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা মন পরিচ্ছন্ন ও শান্ত হয়। এ অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করলে সাধকের আসক্তি ও বিদ্বেষ আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায়। শুভ চিন্তার উদয় হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গুরুজন, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দিকে ভাবনা করে শত্রুর মঙ্গল চিন্তায় মন নিবিষ্ট হয়। এরূপে মৈত্রীভাব বিশ্বের প্রাণীকুলের প্রতি প্রসারিত করতে হয়। তখন সাধকের সাধনায় পূর্ণতা আসে। ক্রোধ, হিংসা, হীনপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়। আত্ম-পর ভেদজ্ঞান রহিত হয়ে সাধকের মৈত্রীসিক্ত প্রথম ধ্যানের উদয় হয়। উপর্যুক্ত কারণে সাধক বৈরীশূণ্য ও বেদনাহীন উদার মৈত্রী মানস নিয়ে অবস্থান করে (ব্রহ্মচারী, ৬০)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তি বিশ্বশান্তির সহায়ক শক্তি। এরূপ ব্যক্তি মানব সমাজের অলংকার। মৈত্রী বা বন্ধুত্বের দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। বিশ্বমৈত্রী ছাড়া বিশ্বশান্তি,

মানবিক বিশ্ব, ন্যায় ভিত্তিক, সাম্যভিত্তিক, প্রবঞ্চনামুক্ত, সুষম মানব সমাজ বিনির্মাণ করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং মৈত্রীর চর্চা, বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। এ মৈত্রীই হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, দুর্নীতিমুক্ত মানবিক সমাজ বিনির্মাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ মৈত্রী ভাবনা দ্বারা হিংস্র মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির হিংস্র মনোভাব পরিহার করা যায়। এরূপ স্বভাবের ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৈত্রী ভাবনা খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ হতে পাওে (মুৎসুদ্দী, ১৩৯)। মৈত্রী হলো একটি উচ্চ আদর্শ বিষয়। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ মৈত্রীতে করে পূর্ণপ্রকাশ। দ্বেষ পরিহার পূর্বক এবং ক্ষান্তিকে ধারণ করতে পারলে মৈত্রী ভাবনায় উন্নতি করতে হয়। যেমন : দ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে। এটা দ্বেষের স্বভাব। ক্ষান্তিই তপস্যার নামান্তর। এটা ক্ষান্তির স্বভাব (চৌধুরী, ২৪৯, ২৫০)। বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে মৈত্রী ভাবনার শক্তি সম্পর্কে রয়েছে : পৃথিবীতে অশুভ বা অন্যায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে আছে। তার শক্তি প্রবল। নানাবিধ শুভ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রভাব রয়ে গেছে। কিন্তু ঐ ভয়ংকর অন্যায়কে জয় করবার শক্তি কারও নেই। তাকে জয় করতে পারে 'মৈত্রী'। পরলোক, মোক্ষ বা নির্বাণ তো দূরের কথা, এটা না থাকলে সংসারই যে অচল হয়ে যায় (পাল স্থবির, ১০)। সূত্রপিটকের মধ্যম নিকায়ের অন্তর্গত মহারাহুলোবাদ সূত্রে রয়েছে : মৈত্রী ভাবনা করলে চিত্তে যে ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) উৎপন্ন হয় তা ধ্বংস হবে (মহাস্থবির, ৭২)। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দ্বেষহীন অবস্থাই হলো মৈত্রী। মৈত্রী দশ পারমীর একটি অন্যতম উপাদান। জীবন সাধনায় পরিপূর্ণতা, মানবিক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ মৈত্রী পারমীকে সাধনার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়; মানব জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এমনকি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও মৈত্রী ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে যেরূপ ইহজীবনে স্বীয় অশান্ত, অস্থির মনকে প্রশান্ত করে অনাবিল সুখ শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। তেমনি সাধকও আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির হিংসা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ মৈত্রী পরায়ণ হতে পারলে বর্তমান হিংসা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে যা সর্বতোভাবে সত্য (বিকাশ বড়ুয়া, ৮৯)। দুঃখ-কষ্ট, নানাবিধ বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন। এরূপ জীবনে মৈত্রী ভাবনা ছাড়া চিত্তে প্রশান্তি ভাব আনয়ন করা সম্ভব নয়। চিত্তের প্রসারতা-প্রসন্নতা আনতে হলে মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে অন্তরে অবস্থিত হিংসাভাবকে (পটিঘ) সমূলে ধ্বংস করা সাধকের একান্ত প্রয়োজন। মৈত্রী বিহীন চিত্তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুঃখ নিবৃত্তির সাধনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মৈত্রীগুণে গুণান্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ মৈত্রী সাধনা সর্বদা প্রত্যেকের করা দরকার। বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় মৈত্রী সাধনা দ্বারা মৈত্রী গুণ অন্তরে সঞ্চিত করেছিলেন। যে কারণে বুদ্ধ স্থান কাল পাত্র ভেদে মানবের মঙ্গলার্থে উপদেশচ্ছলে এ মৈত্রীশক্তি, মৈত্রীগুণ, মৈত্রী সাধনার উপকারিতা উপস্থাপন করেন (বড়ুয়া, ৯০)। এ মৈত্রী সম্পর্কে সূত্রপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘনিকায়ের তেবিজ্জ সূত্রে রয়েছে : বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দ্বারা এক, দুই তিনদিক ব্যাপ্ত করে বিহার করেন, এরূপে চতুর্দিকে। এভাবে তিনি ঊর্ধ্বে, নিম্নে, তির্যক দিকে, সর্বলোকব্যাপী, সর্বত্র, সর্বব্যাপী অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, বিদ্বেষ বিরহিত হয়ে মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত ব্যাপ্ত করে অবস্থান করে, বলবান শঙ্খার অল্পায়াসেই চতুর্দিকে শঙ্খ ধ্বনি সকলের শ্রুতিগোচর করে, তেমনি এ মৈত্রী ভাবনা ও চিত্ত বিমুক্তি সর্বভূতে নির্বিশেষে নিযুক্ত হয়, কেউই উপেক্ষিত হয় না (শীলভদ্র, ১৮৬)। এরূপে বাস করাই ব্রহ্মের সাথে মিলিত হওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, মৈত্রী ভাবনার গুণাবলী অপরিসীম। সুতরাং সর্বদা মৈত্রী ভাবনায় রত থাকা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের এক সর্বোত্তম উপায়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধ উপদিষ্ট বিশ্বমৈত্রী ভাবনার বিকল্প নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের অটুট বন্ধনের জন্য, সুখী পরিবার গঠনে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, সর্বক্ষেত্রে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থান, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এ মৈত্রী শক্তির প্রভাব অতুলনীয়। বুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে 'ককচোপম সূত্রে' মৈত্রীভাব পোষণের জন্য যে উপদেশ প্রদান করেন তা প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধ বলেন: কেউ যদি তোমাদেরকে কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, পাপমূলক কথা বলে, নিরর্থক দ্বেষ পোষণ করে কিছু বলে, তথাপি তোমাদের এ শিক্ষাই করা কর্তব্য যে, এরূপ আচরণে আমাদের চিত্ত কলুষিত হবে না, আমরা পাপ বাক্য উচ্চারণ করবো না, আমরা হিতকামী করুণা পরবশ হয়ে বিহার করবো। আমরা চিত্তকে মৈত্রীতে পূর্ণ রাখবো, অন্তরে দ্বেষ পোষণ করবো না। আমরা সে ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী চিত্ত হয়ে অবস্থান করবো। আমরা সমগ্র ভূবনকে রিপুর দূরব্যাপী, অপরিমেয় বৈর ও বিদ্বেষ বিরহিত মৈত্রী চিত্ত দ্বারা বাস করবো। সর্বলোকের প্রতি অবৈর, অপ্রমেয়, মৈত্রীসহগত-চিত্তে অবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন (বড়ুয়া, ১৩৭, ১৪০-১৪৩)। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, এ মৈত্রী শুধুমাত্র যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে তা নয়। উপরন্তু মৈত্রী অপরের কল্যাণ, মঙ্গল কামনার দ্যোতক। অভিধর্ম পিটকের বিভঙ্গে রয়েছে : মৈত্রী অব্যাপাদধাতুমূলক। কিন্তু এটা হৃদয়ের উদগ্র স্নেহের পরিপোষক (মজ্জাতীতি মেত্তা)। সর্বজগতের সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী বা ভালোবাসা মৈত্রীকর্ম বা মিত্রতাকরণ, মৈত্রীভাব অর্থাৎ সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্বকরণকে একত্রে মৈত্রী চিত্তবিমুক্তিকে মৈত্রীচিত্ত নামে অভিহিত করা হয় (ভিক্ষু, ৩০৫)। সূত্রপিটকের খুদ্দকপাঠের করণীয় মৈত্রী সূত্রে রয়েছে :

নহি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতী'তি (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং ১০, ৪৭)।

অর্থাৎ, সর্ব জগতের সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, প্রেমভাব পোষণ করাই পুনর্জন্ম নিরোধের উত্তম পন্থা।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূপরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা
(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, *শ্লোক নং*-৩, ৪৪)।

অর্থাৎ, তিনি (মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তি) এমন কিছু নীচ আচরণ করবেন না, যাতে অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন; তিনি এরূপ প্রত্যাশা করেন যে, সকল প্রাণী সুখী, ভয়হীন ও সন্তুষ্টচিত্ত হোক।

ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞএঞথ্থ নং কঞ্চি,
ব্যারিসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য
(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৬, ৪৫, ৪৬)।

অর্থাৎ, একে অপরকে বঞ্চনা করবে না, কাউকেও অবজ্ঞা করবে না; ক্রোধ ও হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে কারও দুঃখ কামনা করবে না।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসমপত্তং
(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৮, ৪৬)।

অর্থাৎ, জগতের উপর দিকে, নিম্নদিকে, তির্যকভাবে সর্বত্র প্রত্যেক জীবের প্রতি ভেদাভেদ মুক্ত, শত্রুতাতাহীন অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করবে।

তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সযানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিটএঠয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহ।

(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৯, ৪৭)।

অর্থাৎ, স্থিত অবস্থায়, বিচরণ করতে করতে, উপবিষ্ট অবস্থায়, শয়ন অবস্থায়, যতক্ষণ নিদ্রিত হবে না ততক্ষণ এ স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মবিহার বলে।হৃদয় যাঁর মেত্তার অধীন, তিনি সর্বদা দৃঢ়মনোভাবসম্পন্ন ও দান প্রবণ হন এবং কারও অনিষ্ট সাধন করে না। সুত্রনিপাতে রয়েছে : মেত্তাপরবশ ব্যক্তি মার কর্তৃক বিমোহিত মিত্র ব্যক্তিরও সংসর্গ পরিত্যাগ করেই চলেন (চৌধুরী, শ্লোক নং-১, ১৩)। মৈত্রীর সর্বজনীন ও উদার পথে অগ্রসর ব্যক্তি কালক্রমে প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয়ও জয় করতে পারেন। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তি শত্রুকেও মিত্রের মতই ভালোবাসতে সমর্থ হন। নিখিল বিশ্ব, এমনকি, দেবলোকও তাঁর প্রতি নম্র হয়। মিলিন্দ প্রশ্নে রয়েছে : মেত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি অকুতোভয়ে চলাচল করতে পারে, কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি অগ্নি, বিষ, কিংবা অস্ত্র দ্বারাও মৈত্রী ভাবনাকারীর অনিষ্ট করা সম্ভব হয় না। (মহাস্থবির, ১৬৮-১৭০) বুদ্ধ স্বয়ং বলেন,

> *"ভিক্ষুগণ! আমি অতীত জন্মে এক সময় সাত বৎসর মাত্র মৈত্রী ভাবনা করে সপ্ত মহাকল্প এ কামলোকে জন্মগ্রহণ করিনি। কল্প শেষে আভাস্মর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছি। বহুবার ব্রহ্মা থেকে মহাব্রহ্মা, অপরাজিত সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান এবং স্বীয় চিত্তকে বশীভূত রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমি ছত্রিশ বার দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছি। বহুশতবার বিনাদণ্ডে, বিনাশস্ত্রে পৃথিবী জয়কারী, সপ্তবিধ রত্নলাবী, ধার্মিক, ধর্মরাজ চক্রবর্তী রাজা হয়েছি"*(স্থবির, ১৫-১৭)

সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের ইতিবুত্তক গ্রন্থে রয়েছে : একটি সত্ত্ব বা জীবের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হলেও মহাকুশল বা পুণ্য সঞ্চিত হয়। পরন্তু সর্বজীবের প্রতি নিজের প্রিয় সন্তান সদৃশ হিতানুকম্পায় চতুর্দিকে প্রসারিত বহুভাবে অতিশয় অপ্রমেয় মৈত্রী বিতরণে চৌষট্টি মহাকল্প পর্যন্ত নিজের কৃত কর্মের সুফলে প্রবর্ধিত হয়ে প্রবর্তিত হতে সমর্থ এবং পরিশুদ্ধ চিত্ত আর্যপুদ্গল শ্রেষ্ঠ পুণ্যে সজ্জিত হতে সফল হন। পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আমি ধর্মার্জনের জন্য যত উপাদান আছে, তা সমস্ত একত্রে মৈত্রীভাবনার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যেরও নয়। বিমুক্ত চিত্তে মৈত্রী ভাবনাই সকল সীমা অতিক্রম করে প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বলতর হয় (স্থবির, ২০-২২)। বিশ্বের সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনা করাই হলো মৈত্রী ভাবনা। সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, নীরোগ জীবন-যাপন করুক এবং সুখে অবস্থান করুক-এরূপ মনোভাব পোষণ করাই হলো মৈত্রী ভাবনার মূলমন্ত্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৈত্রী ভাবনার মূল অবলম্বন হলো সর্বসত্ত্ব বা সকল প্রাণী। সকল প্রাণীর কল্যাণকামী, সুহৃদ হিসেবে সকল প্রাণীর সুখ, শান্তি কামনাই হলো মৈত্রী। মৈত্রী ভাবনায় হিংসা বা হত্যা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ মৈত্রী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় তথা মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে সমগ্র জীব-জগতের প্রতি অহিংসা পোষণ ও আত্মভাব পোষণ করাকে বোঝায়। এমতাবস্থায় মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচে যায় এবং হিংসা-ঘৃণা, দূরীভূত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পৃথিবী হয়ে উঠবে পরিবার; সকল মানুষ একই পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবে। পৃথিবীতে তখন বর্ষিত হবে শান্তি, মহাশান্তি, মানবিকতা (বড়ুয়া, ১৬৮)। সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্তর্গত অনুস্মৃতি বর্গের

মৈত্রী সূত্রে রয়েছে : ব্যাপাদ ধ্বংসের ক্ষেত্রে মৈত্রীর ক্ষমতা অতুলনীয়। মৈত্রীভাব পোষণকারী ও মৈত্রী ভাবনাকারী ব্যক্তি চিত্তবিমুক্তির মাধ্যমে, জাগরণশীলতা, সম্যক প্রচেষ্টা, মৈত্রী ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা, উত্তমভাবে অনুশীলন বৃদ্ধির দ্বারা একাদশটি *(অংগুত্তর নিকায়–৫ম খণ্ড, মূল পালি, ২. অনুস্সতি বগ্গো ৬. মেত্ত সুত্তং)*। উপকারিতা লাভ বা অর্জন করতে পারে। সেগুলো নিম্নরূপ :

- সুখে নিদ্রা যায়।
- সুখে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়
- কোনো প্রকার পাপমূলক স্বপ্ন দেখে না।
- মানুষের নিকট প্রিয়ভাজন হয়।
- অমনুষ্যের নিকট প্রিয়ভাজন হয়।
- বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় দেবগণ রক্ষা করেন।
- অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখ বা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু হতে রক্ষা পায়।
- দ্রুত চিত্ত একাগ্র হয় অর্থাৎ যথাকালে শান্তিময় মৃত্যু হয়।
- মুখচ্ছবি বা মুখ বর্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল থাকে।
- মৃত্যুতেও দেহাবশেষ প্রদীপ্ত হয় ও সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে। এবং
- মৈত্রী ভাবনাকারী ইহজীবনে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত না হলেও মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে সুপ্ত বুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের প্রতিসম্ভিদা মার্গ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ মৈত্রী ভাবনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রী ভাবনা করলে চিত্তবিমুক্তির অলঙ্কার, সুসজ্জিত, সুপরিবৃত হয়। ফলে চিত্ত প্রসন্নতা বা প্রশান্তি উৎপন্ন হয়। আলোকিত মানুষ হতে সক্ষম হয়। ক্লেশসমূহ ধ্বংস করা সম্ভব হয় (ইন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য ২০১২, ৩৫৬-৩৬০)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণে মৈত্রী ভাবনা অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। সর্বক্ষেত্রে সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক মানব সমাজ বিনির্মাণে মৈত্রী শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। মৈত্রী ভাবনায় সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ মৈত্রী ভাবনায় সকল প্রাণীর প্রতি সমতার প্রকাশ পরিস্ফুট হয়েছে। উপর্যুক্ত কারণে মৈত্রী দর্শন দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার বিকাশ সম্ভব হয়।

করুণা ভাবনা

'করুণা' শব্দটি অন্যের দুঃখ-কষ্ট উপশম করার মহৎ ইচ্ছা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা, পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, সহানুভূতি ইত্যাদি শব্দগুলো করুণার পরিপূরক। এরূপ চিত্ত এ করুণার সাথে সহজাত ও সংশ্লিষ্ট হয় বলে তাকে করুণাসহগত চিত্ত বলে অভিহিত করা হয় (ভিক্ষু, ৩০৬)। একজন ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি একজন দুর্গত (দরিদ্র) ও দুরাবস্থাগ্রস্ত (দুঃখী) ব্যক্তিকে দেখে তার প্রতি করুণাপরায়ণ হয়। অনুরূপভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীকে করুণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অন্যের দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছা এর কৃত্য বা লক্ষণ। করুণার প্রত্যক্ষ শত্রু হলো হিংসা এবং পরোক্ষ শত্রু হলো পরশ্রীকাতরতা। অন্যের দুঃখ দেখে হৃদয় কম্পিত হয় বলে করুণার অপর নাম অনুকম্পা। আর্তপীড়িত পুত্রের প্রতি পিতার যে প্রেম, তদ্রূপ জগতের সমস্ত প্রাণির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনই হলো করুণা। এ চিত্তবৃত্তি নিষ্ঠুরতাকে

প্রত্যাখ্যান করে। মৈত্রী ভাবনার ন্যায় করুণাকেও একইভাবে প্রবৃদ্ধি করতে হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর রচিত বিসুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে করুণা ভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন :

> *"নিষ্করুণ বা নিষ্ঠুর লোকের পরিণাম স্মরণ করে ও শীলের গুণ প্রত্যক্ষ করে করুণা ভাবনা আরব্ধ করবেন। প্রথমে প্রিয় ব্যক্তি, প্রিয় বন্ধু, মধ্যস্থ ও শত্রুকে উপলক্ষ্য না করে যে দুর্গত, দরিদ্র, হস্তচ্ছিন্ন ভিক্ষাপাত্র হস্তে নিত্য অনাথশালায় গমন করে, তথায় তার শয্যা হস্তপাদের বিষাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে লক্ষ করে করুণা ভাবনা করবেন"*(পূর্ণানন্দ ১৯৩৬, ২০৬)।

করুণাসিক্ত চিত্ত সর্বপ্রাণির প্রতি করুণা প্রসারিত করে মৈত্রী ভাবনার মত করুণা মন নিয়ে অবস্থান করেন (ব্রহ্মচারী, ৬১, ৬২)। করুণার দুটি দিক আছে। যেমন : একটি হৃদয়বৃত্তি হিসেবে অনুকম্পাবোধ; অন্যটি সেই বোধ হেতু দুর্দশাগ্রস্তের দুঃখ মোচনের প্রবল ইচ্ছা। সাধকের অন্তরে যখন করুণার উদ্রেক হয় তখন স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। তখন তিনি পরহিতার্থে আত্মনিয়োগ করেন। করুণা সাধনা দ্বারা আত্মপর ভেদাভেদ ঘুচে যায় (ব্রহ্মচারী, ৬১, ৬২)। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনে এই করুণাকে আরও সম্প্রসারিত করে মহাকরুণায় উন্নীত করেছে। মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বের সমস্ত চিন্তা, কর্ম, সাধনাই পরার্থে উৎসর্গকৃত। বোধিসত্ত্বের ধর্মজীবন, সাধনা, চরিত্র বিশোধন প্রভৃতি স্বর্গ কিংবা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য নয়, নিজের ভোগ ঐশ্বর্যের জন্যও নয়; বরং সর্বজীবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য তাঁর ধর্মজীবন, চরিত্র রক্ষা। মহাকরুণার আবেশে বোধিসত্ত্ব সর্বজীবের উদ্ধারব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনকল্পে অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করেন। এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তবু তাঁর মহাকরুণা সাধনা থেকে বিচ্যুত হন না (স্থবির, ২২-২৩)। সাধক করুণা ভাবনার দ্বারা তার স্বার্থপরতা দূরীভূত করে পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করেন। গুণবান একমাত্র পুত্রের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠী, বাবা বা গৃহস্বামীর যেমন মজ্জাগত প্রেম, মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বেরও সমস্ত জীবজগতের ওপর তেমনি মজ্জাগত প্রেম। বোধিসত্ত্বের এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পই মহাকরুণার নামান্তর *(শিক্ষাসমুচ্চয়–১৬)*। অন্যকে দুঃখ প্রদান করে আত্মপ্রসাদলাভী ব্যক্তির পক্ষে করুণা ভাবনা করাই সমীচীন (মুৎসুদ্দী, ১৩৯)। নিষ্করুণ বা নিষ্ঠুর লোকের পরিণাম স্মরণ করে ও করুণাশীলের গুণ প্রত্যক্ষ করে 'করুণা ভাবনা' আরম্ভ করতে হয়। যেমন, যদি কোনো দুঃশীল ব্যক্তি বহুবিধ পাপানুষ্ঠান দ্বারা নিজকে নিরয়মুখী করে, কোনো সজ্জন তাকে দেখে চিন্তা করেন যে, 'অহো! মরণান্তে এ লোকটা কতই অনন্ত দুঃখের ভাগী হবে।' এরূপে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করাই হলো করুণা ভাবনার নামান্তর। সাধারণতঃ দুঃশীল ব্যক্তির উপর সুশীল ব্যক্তির করুণা স্বাভাবিক। মৈত্রী ভাবনার ন্যায় করুণাকে যথাক্রমে বৃদ্ধি করে অর্পণা ধ্যান লাভ করতে পারলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অনিবার্য (চৌধুরী, ২৫০,২৫১)। বিশিষ্ট বৌদ্ধ দর্শন গবেষক ও লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর করুণা ভাবনা সম্পর্কে বলেন :

> *"দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয়, অহরহ এরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা"*(ঠাকুর, ৯১)।

সর্বজীবের প্রতি করুণা পোষণ করা একান্ত প্রয়োজন। করুণা ভাবনা দ্বারা মনে যে বিহিংসা (পরপীড়ন প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়, তা বর্জন করা সম্ভব হয় (মহাস্থবির, ৭২)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, অপরের দুঃখ-যন্ত্রণা বিনাশের বা অপনোদনের অভিপ্রায়ই করুণা নামে অভিহিত। দুঃখক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ দেখেই করুণা ভাবের উদয় হয়। পরের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করাই হলো করুণার স্বভাব বা লক্ষণ। অন্যের দুঃখে হৃদয় কম্পিত হয় বলে একে আবার

অনুকম্পা হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। সর্বসত্ত্ব দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করুক–এরূপ প্রার্থনাই হলো করুণা ভাবনার মন্ত্র। করুণার বিপরীত হলো মাৎসর্য। করুণার আলম্বন বা বিষয় হলো পরের দুঃখ। মাৎসর্য চিত্ত বা চিন্তা-চেতনাকে সঙ্কুচিত করে, আমিত্ববোধের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে করুণা চিত্তকে প্রসারিত করে, আমিত্ব লোপে সাহায্য করে (বড়ুয়া, ১৬৮)। বিশিষ্ট অভিধর্ম দর্শন গবেষক বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী করুণা ভাবনা সম্পর্কে বলেন :

> *"পরের দুঃখ অপনোদনেচ্ছা "করুণা"। এর আলম্বন পরের দুঃখ; অসহায় অবস্থা। রুগ্ন সন্তানের আরোগ্য কামনা "করুণা"* (মুৎসুদ্দী, ২৮৪)।

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ করুণা হলো চেতনাভিত্তিক। হিংসা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পরের দুঃখ-কষ্টকে আপনাররূপে গ্রহণ করাই করুণা। করুণার দুটি দিক। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্তরিকতাবোধ, অন্যটি হল দুর্গতের দুর্দশা মোচনে ব্যবস্থা করা। একটি চেতনাভিত্তিক করুণা মানুষের মানবীয় গুণাবলীর একটি অন্যতম উপাদান। এটা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান। দয়ার্দ্র হৃদয়ের বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। করুণার কারণে মানুষ একে অন্যের আপদে-বিপদে এগিয়ে আসে। দুর্গত সর্বসত্ত্বের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সাহয্যের হাত সম্প্রসারিত করে। সর্বসত্ত্বকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপে মানুষের, সমাজের, বিশ্বের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গা তৈরী হয়। যা মানুষের আচরণে দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়। এ করুণা ভাবনা সাধককে সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়। এ ভাবনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এটাকে বুদ্ধের মানবিকতা, মানবতার শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মুদিতা ভাবনা

অন্যের সুখে সুখানুভব করার নামই হলো মুদিতা ভাবনা। আবার পরের দুঃখ দেখে হৃদয় বিগলিত হওয়া, পরের দুঃখ দূরীকরণে তৎপর হওয়াকে বোঝায়। পরিচ্ছন্ন অন্তরে পরের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণে ভূমিকা নেয়া। এ মুদিতার বৈশিষ্ট্য হলো এটি কর্মভিত্তিক। ব্রহ্মবিহার সাধনার তৃতীয় স্তর হলো মুদিতা। মুদিতা তুষ্ট, হৃষ্ট, আনন্দিতভাব, প্রফুল্লভাব প্রকাশ করে। পরের সুখ, সমৃদ্ধি সম্পদ, সৌভাগ্য, যশ, ঐশ্বর্য প্রভৃতিতে প্রসন্ন হওয়াই মুদিতা। ঈর্ষা, মাৎসর্যের ধ্বংস সাধন এর কৃত্য। সাধকের ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন মনেই উদার ও শুভ্র মনোবৃত্তির উদয় হয়। এর ঐকান্তিক অনুশীলনই মুদিতা ভাবনা। এর দ্বারা পরকে আপন করে নেয়া যায়। মৈত্রী, করুণার সঙ্গে বোধিচিত্তে যে ইন্দ্রিয়াতীত অপরিসীম আনন্দ উৎপন্ন হয় তারই নাম মুদিতা। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি একজন প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দর্শন করে মুদিতাপরায়ণ হন। একইভাবে তিনি সর্ব প্রাণীর প্রতি মুদিতা প্রদর্শন করে। পরের সুখে সুখানুভবকে মুদিতা নামে অভিহিত করা হয়। মুদিতাকর্ম বলতে পরের উন্নতি বা মঙ্গল দর্শনে সহানুভূতিকে বোঝায়। আবার মুদিতাভাব বলতে পরের উন্নতি ও ঐশ্বর্য দেখে সন্তুষ্টি বা আনন্দ লাভ করাকে বোঝায়। এরূপ মন, মানস, অনুভব করাকে মুদিতা চিত্ত বলে। অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি সাম্যভাব মুদিতা নামে অভিহিত (ভিক্ষু, ৩০৭)। অন্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদনই হলো মুদিতার লক্ষণ (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৬)। ঈর্ষা, মাৎসর্যের ধ্বংস সাধন এর কৃত্য। সাধকের ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন মনেই উদার ও শুভ্র মনোবৃত্তির উদয় হয়। এর ঐকান্তিক অনুশীলনই মুদিতা ভাবনা। এর দ্বারা পরকে আপন করে নেয়া যায়। মৈত্রী, করুণার সঙ্গে বোধিচিত্তে যে ইন্দ্রিয়াতীত অপরিসীম আনন্দ উৎপন্ন হয় তারই নাম মুদিতা। শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ নয়, অন্যের সুখের মধ্যেই নিজে আনন্দ ও সুখ লাভ করাই হলো মুদিতা। মানুষের যখন কোনো প্রকার স্বার্থবোধ থাকে না, শুধুমাত্র তখনই মানুষ পারে

অপরের সুখে সুখী হতে। সাধনার এ স্তরে উন্নীত হতে পারলে তখন নিজের সাথে অন্যের কোন তফাৎ আর থাকে না। আপন-পর একাত্ম চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার নাম হলো মুদিতা (বড়ুয়া ও কান্তি বড়ুয়া, ৯৬)। যে ব্যক্তি প্রথমে হেসে পরে আলাপে রত হয়, সেরূপ ব্যক্তিকে অবলম্বন পূর্বক যে ভাবনা করা হয় তা 'করুণা ভাবনা' নামে অভিহিত করা হয়। যে ব্যক্তি সুখে নিরুদ্বেগে জীবন-যাপন করছে, তাকে দর্শন করে 'অহো! এ ব্যক্তি বেশ মনানন্দে বাস করছে; অন্যান্য লোকও তার ন্যায় সন্তুষ্টভাবে বাস করুক।' এরূপে মুদিতা ভাবকে সম্প্রসারিত করে এক এক দিক ব্যাপৃত করতে হয়। যদি কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি, পরিবার দরিদ্র হয়, সে ব্যক্তি তার পূর্বাবস্থা স্মরণ করে মুদিতা ভাবনা করতে পারে। অথবা যে ব্যক্তি বা পরিবার আবার সম্পদশালী হয়ে ভবিষ্যতে সুখে থাকতে সমর্থ হবে। এরূপ ভবিষ্যৎ ভেবে মুদিতা ভাবনা করা যায়। এ নিয়মে যথাক্রমে প্রিয় ব্যক্তি হতে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে পর্যন্ত অনুস্মরণ করে মুদিতা ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে হয়। এ ভাবনার মাধ্যমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত (চৌধুরী, ২৫১)। সাধনমার্গের তৃতীয় স্তর অনাগামী ফল যিনি লাভ করেন তিনি সদানন্দে বিরাজিত। মুদিতা ভাবনার দ্বারা অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, একে প্রশংসাসূচক আনন্দও বলা হয়, এর দ্বারা পরম শত্রুর প্রতিও ঈর্ষা ধ্বংস হয়। মৈত্রী ও করুণা সম্প্রসারিত করা যতো সহজ, মুদিতা ভাবনা ততো সহজ নয়। দুঃখীর দুঃখে অনেকের দুঃখানুভূতির প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্যের সুখ-সমৃদ্ধি ও পুত্র-কন্যার উন্নতিতে প্রশংসার চেয়ে মানসিক দুশ্চিন্তারই প্রতিফলন ঘটে। নিকট আত্মীয়ের উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেও শত্রুর ক্ষেত্রে তা হয় না। (Mahathera, 375-376)। উপর্যুক্ত কারণে সাধককে মুদিতা ভাবনার ক্ষেত্রে আরও বীর্যবান ও উদ্যোগী হতে হয়। মুদিতা ভাবনা ব্যক্তিবিশেষ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র প্রাণিজগতের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকে। আত্মপর বা শত্রু মিত্র ভেদাভেদ থাকে না। মুদিতা ভাবাপন্ন ব্রহ্মবিহারীর নিজ স্বার্থপরতা বলতে কিছুই থাকেনা (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৭)। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনে নিরপেক্ষতাকে উপেক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হোক, এ চিন্তা মুদিতা ভাবনা (ঠাকুর, ৯১)। মুদিতা (সুখীর প্রতি প্রসন্নতা) চিত্ত উৎপাদন করা উচিত। এ মুদিতা ভাবনা বৃদ্ধির মাধ্যমে চিত্তে যে অশান্তি উৎপন্ন হয় তা ধ্বংস করা যায় (মহাস্থবির, ৭২)। সর্বসত্ত্ব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক–এটাই হলো মুদিতা ভাবনার মন্ত্র। ঈর্ষা হলো মুদিতার প্রতিপক্ষ। ঈর্ষা রাক্ষসী, মুদিতা দেবী (বড়ুয়া, ১৬৮)। বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মুদিতা সম্পর্কে বলেন :

> *"পরের সুখ-সম্পদ অনুমোদন করাই হলো "মুদিতা"। যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি কামনা "মুদিত"* (মুৎসুদ্দী, ২৮৪)।

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির পক্ষে মুদিতা ভাবনা বিশেষ উপকারী (মুৎসুদ্দী, ১৩৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ মুদিতা ভাবনা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করতে সাহায্য করে। আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষমতা প্রদর্শনে নিরুৎসাহিত করে। অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এ মুদিতা ভাবনা। মাৎসর্য নির্মূলে সাহায্য করে। ঈর্ষার বিলুপ্তি ঘটায়। অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করলে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এ ভাবনা অন্যের স্বার্থে আঘাত করাকে, হিংসা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। বরং অন্যের সুখ দেখে ঈর্ষাকাতর না হয়ে সমসুখী হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করে। এ ভাবনা উদার হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাবনা বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপেক্ষা ভাবনা :

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ স্তর হলো উপেক্ষা ভাবনা। পালিতে উপেক্খা যা বাংলায় হয় উপেক্ষা। সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়–উপ+ইক্খা+ উপেক্খা। এখানে 'উপ' অর্থে যথার্থতা, নিরপেক্ষতা এবং যুক্তিযুক্ততা প্রভৃতি ভাবের দ্যোতনা করে। 'ইক্খা' অর্থে বোঝায় দর্শন করা, নিরীক্ষণ করা এবং উপলব্ধি করা। বস্তুতঃ উপেক্ষা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি অথবা নিরপেক্ষ দর্শন যা হবে কোনো প্রকার আসক্তি বা বিরক্তিহীন, কোনো প্রকার আনুকল্যতা বা প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত (বড়ুয়া সম্পাদিত, ৯৬)। 'উপেক্ষা' শব্দটি বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য। উপেক্ষা শব্দের অর্থ হলো নিরপেক্ষভাব। সুখও নয়, দুঃখও নয় এরূপ মধ্যস্থভাবই উপেক্ষা। এটা মনের, চিত্তের নিরপেক্ষভাব কিংবা সাম্যভাবও বলা যায়। প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয় এমন একজন ব্যক্তিকে দেখে মনে আনন্দ কিংবা বিষাদ কোনোটিরই সঞ্চার হয় না (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৭) উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চিত্তের সাম্যাবস্থাই উপেক্ষা নামে অভিহিত। চিত্তের সাম্যাবস্থাকে (সুখ, দুঃখ, সর্বাবস্থায় অভিন্ন অনুভূতিকে) উপেক্ষা বলে। এটা হলো লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। উপেক্ষা ভাবনার প্রভাবে লোভ ও দ্বেষ ধ্বংস হয়। নিরপেক্ষ ভাব এর লক্ষণ। তিনি অষ্টলোকধর্মে মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখেন। সমাধিপ্রবণ মন মধ্যম মার্গ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে) অবলম্বন, অনুশীলন দ্বারা উপেক্ষভাবে উন্নীত হয়। এর উৎপত্তি, প্রবৃদ্ধি এবং ভাবনায় পূর্ণতার জন্য বস্তু ও প্রাণীর প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ। চিত্তের অনুদ্ধত অবস্থাকে "উপেক্ষা: নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ অবস্থার সুগঠনই উপেক্ষা ভাবনা। আত্মনির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বিগ্নতা "উপেক্ষা"। কর্ম স্বকীয়তা জ্ঞানই চিত্তের "উপেক্ষা" উৎপাদক (মুৎসুদ্দী, ২৮৪)। সূত্রপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়ে রয়েছে : উপেক্ষা বা সর্বাবস্থায় সমভাব পোষণ একটি উচ্চভাবের সর্বোচ্চ ক্রম। এ সোপানের প্রথম ধাপই মেত্তা বা সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতভাব পোষণ করা। কালক্রমে এই ভাবই উন্নীত হয় করুণায়। করুণা থেকে উন্নীত হয় মুদিতা বা নিঃস্বার্থ প্রেম। এ মুদিতা ভাবের ক্রমোন্নত অবস্থার নামই হলো উপেক্খা (উপেক্ষা) (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম ও ৩য় খণ্ড, মূল পালি)। ব্রহ্মবিহার সাধনার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর উপেক্ষা। এ স্তরে উপনীত মানুষের নিজের ব্যক্তিগত কোনোরূপ ইচ্ছা বা বাসনা থাকে না। তাই এ স্তরকে উপেক্ষা বলা হয়েছে। উপেক্ষা বলতে সাধারণত লোভ-দ্বেষ-মোহ বর্জিত নিরপেক্ষতাকে বোঝায়। এ নিরপেক্ষতা হলো আপন সাধনা ও চর্চার কারণে অর্জিত এক স্বভাব বৈশিষ্ট্য যা চিত্তকে মানুষের কল্যাণে স্থিত রাখে। নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ এ অষ্টলোক ধর্মের কোনো বিষয়ে আকর্ষণ ও চঞ্চলতা হেতু চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। উপেক্ষার প্রতিপক্ষ হলো লোভ। লোভ ও হিংসা পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হলেই "উপেক্ষা' বোধ অন্তরে জাগ্রত হয় (বড়ুয়া ও কান্তি বড়ুয়া, ৯৬)। উপর্যুক্ত কারণে ভাবনার সমস্ত সুফল উপেক্ষা ধ্যানের আওতাধীন (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৮)। অত্যধিক কামাসক্ত, তৃষ্ণা পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা দর্শন অনুশীলন করা বিশেষ উপকারী (মুৎসুদ্দী, ১৩৯)। বিশ্বের মধ্যে সকল জীবই সমান। কোনো প্রাণী অপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার নয়। দ্বেষ-মমতা, ধনী-দরিদ্র, যশ-অপযশ, জরা-যৌবন, সুন্দর-অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থায়ই সমান–এরূপ সাম্য ভাবনাই উপেক্ষা ভাবনা বলে অভিহিত।প্রত্যেক কার্যের সাথে পূববর্তী কার্যের কারণ (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) নিহিত–এই তত্ত্বের স্বীকৃতিকেই প্রতীত্য সমুৎপাদ বলে। বিশিষ্ট বৌদ্ধ চিন্তাবিদ্ অধ্যাপক ভিক্ষু জে, প্রজ্ঞাবংশ থের উপেক্ষা ভাবনা সম্পর্কে বলেন :

"কোনো উত্তাল তরঙ্গমালা যেমন ভাঙতে পারে না অতলান্ত সমুদ্রের তলদেশের অপার শান্তি; স্তব্ধ নিথরতা তেমন অচঞ্চল হতে হবে উপেক্ষা পারমীর অনুশীলনকারীকে"(বড়ুয়া সম্পাদিত, ৯৬)।

উপেক্ষা পারমী সাধককে ভোগাকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি নিম্ন প্রবৃত্তির বিষয় পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। সব সময় উপেক্ষা চিত্তে বসবাস করা সমীচিন। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, উপেক্ষা ভাবনা করা একান্ত কর্তব্য। এ উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা মানুষের যে প্রতীঘ (প্রতিহিংসা বৃত্তি) রয়েছে, তা ধ্বংস করা সম্ভব হয় (মহাস্থবির, ৭২)। লীন ও উদ্ধত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাই হলো উপেক্ষার নামান্তর। অষ্টলৌকধর্ম (স্থবির ও বড়ুয়া, খুদ্দক পাঠো, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি) মনকে আবিষ্ট করে। এ অষ্টলোক ধর্মে জগৎ আবর্তিত হয়। সাধারণ মানুষ এ লোক ধর্মে বশীভূত হওয়ার কারণে তাদের সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ এ অষ্টলোক ধর্মকে অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিনামদর্শী হিসেবে গ্রহণ করে এগুলোতে কম্পিত বা বশীভূত হয় না (বড়ুয়া, ১৫৮, ১৫৯)। উপেক্ষা পারমীর অনুশীলন বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণে মহামঙ্গল সূত্রের শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন :

ফুট্ঠস্স লোক ধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মংগল মুত্তমং (*খুদ্দকপাঠো*, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি)।

অর্থাৎ, লোকধর্মে চিত্ত স্বভাবতই প্রকম্পিত হয়। কিন্তু যাঁরা সে লোকধর্মে সর্বদা অকম্পিত বা স্থির ব্যক্তি কখনো শোকগ্রস্ত হয় না। তাঁরা ক্লিষ্ট না করে স্বীয় চিত্তকে রাখেন বিরজ বিমল এবং ক্ষমাশীল চরিত্রের অধিকারী হন তাতেই উত্তম মঙ্গল হয়। লোকধর্ম বলতে লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখকে বোঝায়। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে এ চারটি বিপরীত যুগ্মকেই অষ্টলোকধর্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়। মনের স্থিরতা বা সমভাবই হলো উপেক্ষা। কর্মে স্বকীয়তা জ্ঞানই চিত্তের উপেক্ষা উৎপাদক। কর্মই মানুষের বন্ধু বা স্বকীয়–এটাই উপেক্ষা ভাবনার মন্ত্র। সমভাব অবস্থা এর আলম্বন। উপমানুসারে জননীর পক্ষে শিশুপুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি কামনা-উপেক্ষা হিসেবে বিবেচিত। আত্ম-নির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বিগ্নতা-উপেক্ষা (বড়ুয়া, ১৬৯)। চিত্তের সাম্যাবস্থাকে (সুখ, দুঃখ, সর্ববস্থায় অভিন্ন অনুভূতিকে) উপেক্ষা বলে। এটা হলো লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। এটা মনের সাম্যাবস্থা। লোভ ও দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা ধ্বংস হয়। তিনি অষ্টলোক ধর্মে মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখেন। সমাধি প্রবণ মন মধ্যম মার্গ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে) অবলম্বন, অনুশীলন দ্বারা উপেক্ষা দর্শনে উন্নীত হয়। এর উৎপত্তি, প্রবৃদ্ধি এবং ভাবনায় পূর্ণতার জন্য বস্তু ও প্রাণীর প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ। নিম্নোক্ত চারটি (ভিক্ষু ও থের, ৫২) বিষয় দ্বারা উপেক্ষাভাবের জাগরণ ত্বরান্বিত হতে পারে। যেমন :

- প্রাণীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষাভাব, উন্নতি বিচার শক্তি ও অনুভূতির ভাব
- বস্তুর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা
- নিজের বা স্বামীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা
- দাম্ভিক বা স্বার্থপর ব্যক্তি বর্জন দ্বারা।

এরূপ ব্যক্তি স্বীয় ব্যবহার দ্রব্য কাকেও দিতে চায় না। কেউ কিছু চাইলে দিতে অপারগতা প্রকাশ বা কার্পণ্যবোধ করে ও বিমুখ করে থাকে। এ জাতীয় সঙ্গ পরিত্যাজ্য। কারণ এতে উপেক্ষা ভাবের পরিহানি হয়ে থাকে। উপেক্ষা চিত্তের একাগ্রতা, লীনতা ও উত্তেজনার সমতারক্ষা পূর্বক সম্বোধি উৎপাদনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। আলম্বনের প্রতি নিরপেক্ষতা এবং বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানকে বোঝায়। এ অর্থে উপেক্ষা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত শোভন চিত্তের উপেক্ষা। এখানে উপেক্ষা

অর্থে তত্রমধ্যস্থতাকেও বুঝায়। এটা কোনো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট মোহ, স্বাদ, বিষাদে চিত্তকে নিরপেক্ষ রাখে (বড়ুয়া, ২৯,৩০, ১০৪) পাঁচটি (মহাস্থবির, ১৮১)।

- সত্ত্ব মধ্যস্থতা,
- সংস্কার মধ্যস্থতা
- সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তিকে পরিবর্জন
- সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতিউদাসীন ব্যক্তির সংসর্গ এবং
- উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা।

বুদ্ধ বলেন, এখানে সাধক সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) দূর করে। না-দুঃখ, না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এরূপ অবস্থাকে বলা হয় নিরামিষ উপেক্ষা (ভিক্ষু, ৩৫৩,৩৫৪)। একজন সাধক যখন আনন্দ ও বেদনায় কোনো প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করে না অর্থাৎ সুখে যেমন আনন্দ প্রকাশ করেন না আবার দুঃখ যন্ত্রণায়ও কাতর না হয়ে দুঃখমুক্তির প্রচেষ্টাকে ধ্যান-জ্ঞান করে সাধনার চতুর্থ ধ্যান স্তরে উন্নীত হয়ে জ্ঞান অর্জনকেই মূলত উপেক্ষা বোঝানো হয়েছে। অষ্টলোকধর্মকে সমভাবে গ্রহণ করে যোগীমনের সাম্যাবস্থিতি উপেক্ষা। এ উদারভাব চতুষ্টয়কে অবলম্বন করে যে সাধনা করা হয় তা অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত (ব্রহ্মচারী, ৯১)। ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে সে স্বভাবকে লাভ করতে হবে। মানুষ শ্রেষ্ঠ এ স্বভাব দ্বারা মানবিক ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়। মানুষ অন্তরে বাইরে অনুভব করে-সে একটা নিখিলের মধ্যে আছে। সে নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগ সাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্ব মানবের মানবাত্মার তখন এক যোগসূত্র রচিত হয়। তখন স্বাভাবিক গতিতেই সে সকলকে মিত্র জেনে সকলের মঙ্গল কামনা করতে পারে। এটাই হলো মানুষের মহৎ স্বরূপের ধর্ম, সত্য স্বরূপের ধর্ম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন:

> *"সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ, গুণী তাঁরই ধর্ম"* (জানা, ১৩৯)।

সকল জীব সুখী হোক, দুঃখ থেকে প্রমুক্ত হোক এভাব সেই মানবিক স্বভাব থেকেই উদ্গত হয়। তিনি আরো বলেছেন–"*মানুষের ধর্ম, শ্রেষ্ঠ মানব-স্বরূপের ধর্ম।*" জগৎব্যাপী মৈত্রী, প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে ত্যাগ, নির্বাপিত করতে হয়, এ শিক্ষা দিতে বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন দ্বারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। প্রেমের দ্বারা সকল সম্পর্ক সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্পর্ক ছিন্ন হয় না (বড়ুয়া, ১২৫)। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ভাবনার মাধ্যমে তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়। উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয় (বড়ুয়া, ৮৭)। জীবের হিত-সুখ কামনা, পর-দুঃখ দূর করার ইচ্ছা, পরের সুখ সম্পদ অনুমোদন ও চিত্তের অনুদ্ধতাবস্থা গঠন, মানব ধর্মও বটে (চৌধুরী, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২)। উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব বা চতুর্দিকে সমস্ত জগৎ ব্যাপী বিশ্বশান্তির জন্যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা বা বিনির্মাণ করা উচিত। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনার ফলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। মৈত্রী হলো সর্বজীবের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম বা ভালোবাসা। অন্যের দুঃখে কাতর হওয়ার নামই করুণা নামে বিবেচিত। সর্বজীবে দয়াকে এর অন্তর্ভূক্ত করা যায়। অপরের সুখে সুখী হওয়াই হলো মুদিতা। সকল জীবের মধ্যে সাম্যভাব বা মধ্যস্থতা ভাবের উত্তরণই উপেক্ষা। এতে সাধকের মন সুখ-দুঃখের অতীত এমন এক অবস্থায় নিবিষ্ট হয় যাতে দুঃখের অনুশোচনা ও সুখের আতিশয্য কোনোটাই পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা শূন্যতা বা ইংরেজি পয়েন্টকে উপেক্ষা

বলে। জীব-জগতকে নিয়েই সাধককে এ চার প্রকার ভাবনা করতে হয়। কোনো লোকের ভালো-মন্দ অবস্থা পরিজ্ঞাত হয়ে তাদের সুখে-দুঃখে চঞ্চল না হয়ে ও চিত্তের শান্ত-ভাবালম্বনে উপেক্ষা ফল প্রত্যক্ষ করে নিজকে প্রকৃতিস্থ করাই মধ্যস্থ ব্যক্তির লক্ষণ। সর্বদা উপেক্ষাভাব প্রদর্শনে উপেক্ষা ভাবকে জাগ্রত করতে হয়। মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখে উপেক্ষা ভাবে থাকলে উপেক্ষা ভাবের বিকাশ ঘটে। যে কারণে শত্রুও নয়, মিত্রও নয়, এমন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে উপেক্ষার সঞ্চার করা সমীচীন। উপেক্ষার লক্ষণ হলো নিরপেক্ষতা। সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি অদুঃখ-অসুখ বেদনা। এটা কায়িক উপেক্ষা। মানসিক সুখ-দুঃখহীন বেদনাও চিত্তজ উপেক্ষা। কুশল চৈতসিক হিসাবে বোধ্যঙ্গের উপেক্ষা। ব্রহ্মবিহারের উপেক্ষা ও সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানজ, বেদনাজ নয় (চৌধুরী, ২৫১, ২৫২)। বিশিষ্ট বৌদ্ধ তত্ত্ববিধ ও লেখক আচার্য শান্তিদেব বলেন:

> *"এই দুঃখময় পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করিতে হইলে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দেশ, নানা জাতি বা নানা জনরূপে না দেখিয়া এক অখণ্ড পৃথিবী বা প্রাণিলোক হিসাবেই দেখিতে হইবে। দুঃখকে আমার দুঃখ, তাহার দুঃখ, এ জাতির দুঃখ, এ দেশের দুঃখ–এভাবে বিচ্ছিন্ন না দেখিয়া এক অখণ্ড দুঃখরূপে দেখিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। নচেৎ পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর হইবে না। মোহ-মুগ্ধ জনগণ নিজ নিজ খণ্ড খণ্ড সুখ আহরণের চেষ্টায় একে অন্যকে দুঃখ দিয়া প্রত্যেকেই ঘোর দুঃখ আহরণ করিতেছেন"* (স্থবির, ১১)।

উপর্যুক্ত কারণে জাগ্রত ও উন্নত জীবন গঠনের জন্য মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা–এ চার প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনা চর্চা করা প্রত্যেক নরনারীর জীবনে একান্ত অপরিহার্য। ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবন পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে ব্রহ্মবিহারের অনুশীলন করতে হবে। বাদ-বিসংবাদ, ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিসমাপ্তিও ঘটতে পারে একমাত্র ব্রহ্মবিহার সাধনার মাধ্যমে। মানসিক উৎকর্ষ ব্যতীত প্রকৃত শান্তি আসে না। এ সাধনপ্রণালী ব্যক্তি জীবনকে পরিশীলিত করে তা ক্রমশ সমাজজীবনে প্রতিফলিত করতে পারলেই বিশ্বশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ লোভ, দ্বেষ, মোহকে অস্ত্রের আঘাতে কিংবা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে প্রশমিত করা যায় না। এটি ক্ষণিক সমাধান। একমাত্র ব্রহ্মবিহারের অনুশীলনের মাধ্যমেই মানব সমাজকে অটুট ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। ব্রহ্মবিহার ভাবনা স্থান, কাল পাত্রের ঊর্ধ্বে সর্বজনীন সাধন প্রণালী (মুৎসুদ্দী, ১৩৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ চতুর্বিধ অপ্রমেয় ভাবনার অন্য নাম বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনা। ব্রহ্ম শব্দ শ্রেষ্ঠার্থ বাচক। যেমন ব্রহ্মচারী। এ ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন করা সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রত্যেক মানুষের জন্যেই অবারিত। ইচ্ছে করলে যে কোনো ব্যক্তি এরূপ ভাবনা করতে পারে। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। এ চার প্রকার ভাবনা করলে বিশ্বে আর কোনো প্রকার অশান্তি থাকবে না।

উপসংহার

উপর্যুক্ত কারণে বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা বিকাশের একমাত্র পন্থা বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা ভাবনা। উৎকৃষ্ট ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের মূলমন্ত্র হলো এ অপ্রমেয় ভাবনা। বুদ্ধের সমগ্র জীবন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, ক্ষান্তিময়, ত্যাগময় মন্ত্রে অনুপ্রাণিত এবং মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, কল্যাণ, মানবিকতা প্রসারের ইতিহাস। ব্যক্তি পর্যায়ে মৈত্রী তথা ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলন করলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হয়। বুদ্ধ ছিলেন মানবতাবাদী মহান পুরুষ। তাঁর হৃদয় ছিলো মানবতার গুণে ভাস্বর। মানবপ্রেম ছিলো তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বের সমগ্র মানব জাতি তথা প্রাণী জগতের সুখ, শান্তি, মঙ্গলের জন্যে বুদ্ধ উপদিষ্ট ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা প্রয়োজন। তিনি মানবকল্যাণমূলক, সাম্যভিত্তিক, অহিংসার ভিত্তিতে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানবিক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানুষের চির শান্তির প্রয়াসে এ ব্রহ্মবিহার ভাবনার উপদেশ প্রদান করেন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শন বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের এক অনন্য প্রয়াস। ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা অমানবিকতা, অনৈতিকতা, বিদ্বেষ পরিহার করা গেলে মানবিক ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। এ ব্রহ্মবিহার অনুশীলনের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তিও অর্জন করা সম্ভব হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধঘোষ, ভদন্তাচরিয় রচিত, ভিক্ষু, জ্ঞানশান্ত অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ (বিসুদ্ধিমগ্গ)*, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ৮ জানুয়ারি, ২০১৭।

২. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার অনূদিত, *ধর্মপদ*, কলকাতা, ১৯৫৪।

৩. বড়ুয়া, জিতেন্দ্রলাল, *বৌদ্ধধর্মের কর্মবাদ বনাম সৃষ্টি রহস্য*, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ২০০০।

৪. গুপ্ত, শ্রীশান্তিকুসুম দাশ, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

৫. বড়ুয়া, প্রফেসর ড. সুমঙ্গল, বড়ুয়া, ড. বেলু রানী, *বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

৬. *'মেত্তাচিত্তন্তি' মিজ্জতী'তি মেত্তা, সিনিযহতীতি অত্থো। মিত্তে ভবা, মিত্তস্স বা এস পবত্তীতিপি মেত্তা। লক্খণাদিতো পন হিতাকারপ্পবত্তিলক্খণা, হিতূপসংহাররসা, আঘাত বিনযপচ্চুপট্ঠানা, সত্তানং মনাপভাবদস্সন পদট্ঠানা। ব্যাপাদূপসমো এতিস্স সম্পত্তি, সিনেহসম্ভবো বিপত্তি। সা এতস্স অত্থীতি মেত্তচিত্তং (ইতিবুত্তক, মূল পালি)*।

৭. মহাস্থবির, শান্তরক্ষিত, *বৌদ্ধ সাধনা নীতি*, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ শে জুলাই ২০১০।

৮. বড়ুয়া, ড. সুকোমল ও বড়ুয়া, সুমন কান্তি, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০।

৯. মুৎসুদ্দী, শ্রীবীরেন্দ্রলাল অনূদিত ও সম্পাদিত, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম*, চট্টগ্রাম, ১৮ জুলাই ১৯৪০।

১০. ভিক্ষু, শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় অনূদিত, *অভিধর্ম পিটকে বিভঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ২০ শে জুলাই ২০১২।

১১. মহাস্থবির, শ্রীধর্ম্মজ্যোতি ও বড়ুয়া, শ্রীনীলাম্বর অনূদিত, *খুদ্দকপাঠো* (মূল, অন্বয় ও অনুবাদ), পালি বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ১২, হেমসেন লেন, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে, ১৯৮৭।

১২. *অহং অবের হোমি, অব্বাপজ্জ হোমি, অনীঘা হোমি, সুখী অত্তানং, পারিহরোমি, অহং বিয ময্হং আচরিযো, উপাজ্জায, মাতা পিতরো হিতো সত্তা, মজ্জত্তিকো সত্তা, বেরী সত্তা, অবের হোন্তু, সুখী অত্তানং, পরিহরন্তু দুক্খমুঞ্চন্তু যথালদ্ধা সম্পত্তিত্তো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা* (থেরো ভদন্ত ধর্মতিলক ও মুৎসুদ্দী, বীরেন্দ্র অনূদিত, *সদ্ধর্ম রত্নাকর*, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৩৬।

১৩. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, *বৌদ্ধধর্ম*, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৫।

১৪. *"ভীতাশ্চ নির্ভয়াঃ সন্তু, শোকার্তার প্রীতি লাভিনঃ*

উদ্বিগ্নাশ্চ নিরুদ্বেগ, বুদ্ধিমত্তা ভবন্তু চ।" বোধিচর্যাবতার
১৫. *"আরোগ্যাং রাখিনা মন্তু সচ্যুন্তাং সর্ববন্ধনাৎ,*
দুর্বলা বলিনঃ মন্তু স্নিগ্ধচিত্তার পরস্পরং।"বোধিচর্যাবতার
১৬. স্থবির, জ্যোতি:পাল অনূদিত, দেব, আচার্য্য শান্তি দেব বিরচিত, *বোধিচর্যাবতার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৭৭।
১৭. সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, চূচূঁড়া, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫।
১৮. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, *বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা*, জেতবন বিহার পরিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাস্ট, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪।
১৯. চৌধুরী, সুকোমল, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, কলিকাতা ৭০০০৭৩ : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।
২০. মহাস্থবির, পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, (দ্বিতীয় ভাগ), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৯৫৬, (তাইওয়ান প্রিন্ট)।
২১. বড়ুয়া, ডাঃ সিতাংশু বিকাশ সম্পাদিত, *দশ পারমী ও চরিয়া পিটক* (সানুবাদ), শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির, মৈত্রী পারমী [প্রবন্ধ], চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮।
২২. শীলভদ্র, ভিক্ষু অনূদিত, দীঘ নিকায় [অখণ্ড], (কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪ এ বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।
২৩. বড়ুয়া, শ্রীবেণীমাধব অনূদিত, মধ্যম নিকায়, মূল পঞ্চাশ সূত্র, (কলিকাতা: ১০৬এ, চরকডাঙ্গা রোড, ১৯৪০ খ্রি. (তাইওয়ান প্রিন্টিং)।
২৪. সাধনকমল চৌধুরী অনূদিত, *বিশুদ্ধ সূত্তনিপাত*, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন–১৪০৯।
২৫. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার অনূদিত, *মিলিন্দ্র প্রশ্ন*, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ৫০-টি/১সি, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৫।
২৬. ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, সূত্রপিটকের অর্ন্তগত খুদ্দকনিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ, *ইতিবুত্তক*, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, ১৪ই এপ্রিল, ২০১২।
২৭. বড়ুয়া, সুদর্শন, *ত্রিপিটক*-সংক্ষিপ্তাকার, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ২৭শে জুলাই ১৯৯৯।
২৮. *১. সুখং সুপতি। ২. সুখং পটিবজ্ঝতি। ৩. ন পাপকং সুপিনং পস্সতি। ৪. মনুস্সানং পিযো হোতি। ৫. অমনুস্সানং পিযো হোতি। ৬. দেবতা রক্খতি। ৭. নাস্স অগ্গিং বা বিসং বা সত্থং বা কমতি। ৮. তুবট্টং চিত্তং সমাধিযতি। ৯. মুখবন্নো বিপ্পসীদতি। ১০. অসংমূঢ়ো কালং করোতি।। ১১. উত্তরিং অপ্পটিবিজ্ঝন্তো ব্রহ্মলোকূপগো হোতি (অংগুত্তর নিকায়–৫ম খণ্ড, মূল পালি, ২. অনুস্সতি বগ্গো ঙ. মেত্ত সুত্তং)*।
২৯. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য অনূদিত, *প্রতিসম্ভিদামার্গ*, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙামাটি, ৮ই জানুয়ারি ২০১২।
৩০. পূর্ণানন্দ, শ্রমণ অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ*, কলিকাতা, ১৯৩৬।
৩১. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, *বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা*, জেতবন বিহার পরিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাস্ট, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪।
৩২. *যথাপি নাম শ্রেষ্ঠিনো বা গৃহপতে একপুত্রকে,*

গুণবতি মজ্জাগতং প্রেম, এবমেব মহাকরুণা।
পতিলদ্ধসা সর্বসত্তেসু মজ্জগতং প্রেমেতি (শিক্ষাসমুচ্চয়–১৬)।
৩৩. মুৎসুদ্দী, শ্রীবীরেন্দ্রলাল অনূদিত ও সম্পাদিত, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম*, ১৮ জুলাই ১৯৪০।
৩৪. বড়ুয়া, ড. সুকোমল ও বড়ুয়া, সুমন কান্তি, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০০।
৩৫. Narada Mahathera, *The Buddha and His Teachings*, Colombo, 1963
৩৬. ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া সম্পাদিত, *দশ পারমী ও চরিয়া পিটক* (সানুবাদ), অধ্যাপক ভিক্ষু জে, প্রজ্ঞাবংশ, উপেক্ষা পারমী [প্রবন্ধ], চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৮।
৩৭. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খন্ড ও ৩য় খণ্ড, মূল পালি।
৩৮. লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এগুলোকে একত্রে অষ্টলোকধর্ম বলে (খুদ্দকপাঠো, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি)।
৩৯.অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর-নিকায়*, [চতুর্থ খণ্ড], (সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত), বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।
৪০. *খুদ্দকপাঠো*, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি।
৪১. ভিক্ষু, শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ অনূদিত ও থের, শ্রীমৎ তিলোকাবংশ সম্পাদিত, *অভিধর্ম পিটকে সঙ্গায়ন-প্রশ্ন*, প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ৩০শে মে, ২০১১।
৪২. মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির সংকলিত ও অনূদিত, *মহাপরিব্বিান সুত্তং অর্থাৎ তথাগতের অন্তিমাবদান*, চট্টগ্রাম, ৮ জুলাই, ১৯৪১।
৪৩. ভিক্ষু, শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় অনূদিত, *সূত্রপিটকে সংযুক্ত নিকায়*, চতুর্থ খন্ড, ষড়ায়তন বর্গ, (রাঙামাটি: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২৯শে মে, ২০১৮
৪৪. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, *অভিধর্ম-দর্পণ*, অখণ্ড সংস্করণ, মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্টি বোর্ড, পি৬৮, বসুনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলিকাতা ১৩৯৮ বাংলা।
৪৫. অধ্যাপক রাধারমণ, জানা, *পালিভাষা-সাহিত্য বৌদধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮৫।
৪৬. বড়ুয়া, শ্রীসুধাংশু বিমল, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক : ১৩৯৫।
৪৭. বড়ুয়া, শ্রী মহিম চন্দ্র অনূদিত, *বিমুক্তিমার্গ*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮।